শিল্পী-প্রসঙ্গ

সূচি

ইসমাইল হোসেন সিরাজী ৫৭১
গোলাম মোস্তফার চিন্তাধারা ও গদ্যরীতি ৫৭৬
ওয়ালীউল্লাহ্‌র গদ্যরীতি ৫৭৯
শিল্পী কামরুল হাসান ৫৮৩

ইসমাইল হোসেন সিরাজী

বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের স্মরণীয় পুরুষদের মধ্যে ইসমাইল হোসেন সিরাজী একজন। বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশক পর্যন্ত তাঁর প্রভাব ও খ্যাতি সর্বাধিক পরিব্যাপ্ত ছিল। তিনি জন্মগ্রহণ করেন পাবনার অন্তর্গত সিরাজগঞ্জ শহরে ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দের ১৩ই জুলাই। সিরাজগঞ্জের বাসিন্দা হিসাবেই তিনি নিজের নামের সঙ্গে সিরাজী যোগ করেন। তাঁর সমসাময়িক গুণগ্রাহীরা নানাপ্রকার সম্মানার্থক বিশেষণে ভূষিত না করে কখনই তাঁর নাম উল্লেখ করতেন না। সেকালের মুসলামন পাঠকদের নিকট বিশেষ পরিচিত উপন্যাস 'বঙ্কিম দুহিতা'র রচয়িতা নিজের বইয়ের ভূমিকায় সিরাজী সাহেবের নাম এইভাবে উল্লেখ করেন, 'আমাদের শ্রদ্ধেয় মৌলভী কবি সোলতান বাণীসাগর ও বঙ্গবিখ্যাত, মাননীয় গাজী সৈয়দ আফেন্দী সাহ আবু মোহাম্মদ এসমাইল হোসেন সিরাজী সাহেব।

মফস্বল শহরে লেখাপড়া করেন। সাধারণভাবে সচ্ছল ভদ্র এবং শিক্ষিত পরিবারের সন্তান হিসাবে স্থানীয় বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করবার মতো অনুকূল পরিবেশ তিনি পুরোপুরি লাভ করেছিলেন। পাঁচ বছর বয়সে পাঠশালায় যান, কৈশোরে বিদ্যালয়ে আরবি-ফারসির চর্চা করেন এবং হয়ত বাড়িতে সংস্কৃতও পড়তেন। কিন্তু সুবোধ বালকের মতো কেবল পড়াশুনোয় মগ্ন থাকার মতো স্থিরচিত্ত তিনি কোনোদিনই ছিলেন না। স্বদেশের পরাধীনতার জন্য বেদনাবোধ এবং সমগ্র মুসলিম জাহানের দুর্দশার জন্য উৎকণ্ঠা অপরিণত ছাত্রাবস্থাতেই তাঁকে ব্যাকুল করে তুলেছিল। তাই যখন মাত্র ষোল বছর বয়স তখন পাঠ্যতালিকার বাইরের সুবৃহৎ কর্মময় জগতের ডাকে সাড়া দেবার জন্য গৃহত্যাগ করে বেরিয়ে পড়েন তুরস্ক যাবার উদ্দেশ্য নিয়ে। সে যাত্রার মনোবাঞ্ছা চবিতার্থতা লাভ না করলেও কিশোর সিরাজীর এই ভাবাবেগপূর্ণ আদর্শবাদী মানস প্রবণতার প্রকাশ তাৎপর্যহীন নয়। তুরস্ক সিরাজীব বাল্যস্বপ্নের পূণ্যভূমি। তাঁর পরিণত বয়সের এক উল্লেখযোগ্য কর্মক্ষেত্র।

উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষাংশে যে দু'জন সমাজ-সংস্কারক ও চিন্তাবিদ এ দেশীয় মুসলিম মানসকে সর্বাপেক্ষা প্রবলভাবে আলোড়িত করেন তার একজন হলেন এ দেশের, অন্যজন বিদেশাগত। স্যার সৈয়দ আহমদ খান মারা যান ১৮৯৮ সালে। ইসলামি চিন্তাধারার সঙ্গে আধুনিক জীবনবোধের সমন্বয় বিধান করে কিভাবে অনুন্নত ভারতীয় মুসলমান নিজেকে নয়া জামানার উপযুক্ত সংগঠক রূপে তুলতে পারে স্যার সৈয়দ সারা জীবন নিজের বাণী ও কর্মের মধ্য দিয়ে তার পথনির্দেশ করতে প্রয়াস পান। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের বালক-কিশোর-যুবক-বৃদ্ধ প্রায় সকলেই এই আদর্শের দ্বারা বহুল পরিমাণে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। জামাল উদ্দীন আফগানী স্যার সৈয়দের চেয়ে বয়সে বেশ ছোট ছিলেন, তবে এন্তেকাল করেন ১৮৯৭তে। তুরস্ক-মিশর-আরব অঞ্চলে এই বিপ্লবী চিন্তানায়কের প্রভাব ছিল অপরিসীম। ইসলামকে কতকগুলো প্রথা ও কুসংস্কারের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখার তিনি ছিলেন ঘোরতর বিরোধী। স্যার সৈয়দের মতো তিনিও বিশ্বাস করতেন যে জীবন্ত ধর্মরূপে ইসলাম অবশ্যই জীবনাচরণে যুগোপযোগী বিবর্তন ও সম্প্রসারণের

পক্ষপাতী। তাঁর নীতিজ্ঞান ও বিবেক স্বৈরাচার ও সাম্রাজ্যবাদকে সহ্য করতে আদৌ প্রস্তুত ছিল না। ১৮৭৯ সালে রাজশক্তি কর্তৃক মিশর থেকে বিতাড়িত হয়ে তিনি ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক অন্তরীণাবদ্ধ হন। জামাল উদ্দীন আফগানীর রচনা ও বক্তৃতা তখনকার দিনের আদর্শবাদী দেশপ্রেমিক মুসলমানকে এক নতুন উন্মাদনায় অধীর করে তোলে। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার প্রবল অনুপ্রেরণা সে এখান থেকেই লাভ করে ক্রমশ নিজেকে বিশ্বমুসলিমের ভাগ্য বিপর্যয়ের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে ভাবতে শেখে। কিশোর সিরাজীর মানস গঠনে এই পরিবেশ কতদূর সক্রিয় ছিল এবং কী পরিমাণ স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করেছিল পরিণত বয়সের সিরাজীর যাবতীয় রচনা ও কর্মপ্রচেষ্টা বিশ্লেষণ করলে তা সহজেই অনুভব করা যায়।

১৯০৩ সালে চব্বিশ বছর বয়সে সিরাজী বিয়ে করেন এবং তার মাত্র তিন বছরের মধ্যে স্বদেশী আন্দোলন ঝাঁপিয়ে পড়েন। ১৯০৫ সালে ইংরেজ বঙ্গদেশ দু'ভাগে ভাগ করে, উভয় অংশের সঙ্গেই কিছু কিছু সংশ্লিষ্ট এলাকা জুড়ে দিয়ে নিজেদের শাসনতান্ত্রিক সুবিধার জন্য নতুনভাবে দুটো স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠন করে। পূর্বভাগে পড়ে পুরাতন পূর্ববঙ্গ এবং আসাম। এই নতুন প্রদেশে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। কিন্তু এ ব্যবস্থা সকলের মনঃপূত হয়নি। সমগ্র বঙ্গের আত্মসচেতন শিক্ষিত শ্রেণী তখন প্রায় এককভাবে উচ্চ মধ্যবিত্ত হিন্দুকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। শিক্ষা-সংস্কৃতি-ব্যবসা-রাজনীতি সকল ক্ষেত্রেই হিন্দুর আধিপত্য। এই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে হিন্দুকে ছলনার আশ্রয় নিতে হয়নি, তার তৎকালীন স্বদেশপ্রীতিমূলক কর্ম ও চিন্তার বলিষ্ঠতাই তাকে সকল বাঙালির নেতৃত্ব লাভের স্বাভাবিক অধিকার দান করে। স্বাধীনতাকামী প্রগতিবাদী উদারহৃদয় অল্প কিছু সংখ্যক মুসলমানও স্বেচ্ছায় নিজেদেরকে এদের দলভুক্ত করে নেন। নেতারা বঙ্গভঙ্গ স্বীকার করে নিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁরা বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন গড়ে তুলবার আহ্বান জানালে দেশবাসী জনসংখ্যায় সে ডাকে সাড়া দেয়। ইসমাইল হোসেন সিরাজীও এই সংগ্রামে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। অনলপ্রবাহের কবিতাবলীর মধ্যে সিরাজীর তৎকালীন বিপ্লবাত্মক উগ্র ব্রিটিশবিরোধী মনোভাবের সর্বত্র পরিস্ফুট। পরাধীনতার হীনতা থেকে তিনি মুক্তি চান, বিদেশী রাজশক্তিকে তিনি সমূলে বিনষ্ট করতে বদ্ধপরিকর এবং সেই সঙ্গে হতভাগ্য ঘুমন্ত মুসলামন জাতিকে জাগিয়ে তুলবার জন্য তার অতীত গৌরবের বাণী একাধিক শোকবহ্নিময় চরণে ব্যক্ত করেন। সরকারি মেজাজ এতটা বরদাস্ত করতে পারেনি। ১৯০৮ সালে অনলপ্রবাহের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ১৯১০-এ সিরাজী রাজদ্রোহিতার অপরাধে কারারুদ্ধ হন। ১৯১২ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হয় এবং সিরাজী কারামুক্ত হন। মুক্তিলাভ করেই তিনি তুরস্ক চলে যান। মেডিকেল মিশনের সদস্যরূপে তাঁর তুরস্ক ভ্রমণের অভিজ্ঞতা তিনি পরে গ্রন্থাগারে লিপিবদ্ধ করেছেন। ইসমাইল হোসেন সিরাজীর এই পর্বের জীবন বিশেষভাবে বিশ্লেষণযোগ্য। কারণ এই পর্বেই সিরাজী মানসিকতার এক উল্লেখযোগ্য পালাবদল ঘটে। কেবল সিরাজী নয়, সিরাজীর অব্যবহিত পরের এবং পূর্বের একাধিক দেশহিতৈষী মুসলমান লেখক-ভাবুক-কর্মীর জীবনচেতনায় অবিকল এই পর্যায়ের রূপান্তর সাধিত হয়। মীর মশাররফ হোসেনে হয়েছিল, ইসলামইল হোসেন সিরাজীতে হয়, কায়কোবাদেও হয়েছে। সিরাজী বিয়ে করেন চব্বিশ বছর বয়সে, জেলে যান সাতাশ বছর বয়সে। আন্দোলনে আস্থা সুগভীর ছিল বলেই রাজনৈতিক প্রাণোন্মাদনায় নিজেকে এমন

উজাড় করে ঢেলে দিতে পেরেছিলেন। ধর্মীয় ঐতিহ্যে পরিপুষ্ট মুসলিম চেতনা গভীর ও স্বতন্ত্রভাবে স্বজাতির হিতচিন্তায় নিমগ্ন থাকলেও, স্বাধীনতা অর্জনের তীব্র স্পৃহা অপেক্ষাকৃত প্রাগ্রসর হিন্দুশক্তির সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করে। খণ্ডিত বাংলা এক হোক, হিন্দু-মুসলামনের মিলিত বঙ্গ পরাধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করুক, অন্তর থেকে সিবাজীও প্রথম প্রথম এগুলো কামনা করেছিলেন। কিন্তু আন্দোলন যত সাফল্যের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল, নিজের অভিজ্ঞতার দর্পণে সিরাজীও যেন ততই নিজেকে এক নবালোকিত পটভূমিতে নতুন রূপে প্রত্যক্ষ করতে লাগলেন। অনুরূপ প্রবণতা পূর্বেও ছিল কিন্তু এখন যেন তা ক্রমশ গাঢ়তর ও তীব্রতর হলো। দেশের চেয়ে মানুষের, মানুষের চেয়ে নিজের সম্প্রদায়ের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা, তার পুরাতন ক্ষমতা ও বৈভবকে ফিরিয়ে আনার দায়িত্বই যেন প্রধান হয়ে দেখা দিল। কারাগারের ভেতরে ও বাইরে বসে ক্রমে হয়ত একম ও অনুভব করছিলেন যে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত আন্দোলন সাফল্য লাভ করলেও কোনোক্রমেই সম্মিলিতভাবে উভয়ের জন্য একই পর্যায়ের সুখশান্তি নেমে আসবে না। দুই শরিকের মধ্যে যার শক্তি ও ঐশ্বর্য বেশি, অনায়াসে সেই প্রভুত্ব স্থাপন করবে এবং বিজয়লব্ধ সম্পদের সিংহভাগ দখল করে নেবে। তাই দেখি ভাঙ্গা বাংলা জোড়া লেগে যাবার বৎসরে কারামুক্ত হয়েও সিরাজী স্বদেশের কর্মে আত্মোৎসর্গ না করে খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী বল্‌কান শক্তি কর্তৃক আক্রান্ত তুরস্কের নিপীড়িত মুসলমানকে সাহায্য করবার সেই দূরদেশে ছুটে গেলেন। এই যাত্রা তাৎপর্যপূর্ণ। হিন্দু মুসলিম মিলন কামনার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতীক বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সংগ্রামী কর্মী সিরাজী পরবর্তী পর্বে সম্পূর্ণরূপে ইসলামি আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে, কেবলমাত্র না হলেও প্রধানত বিশ্বমুসলিমের উন্নতি বিধানের জন্য দৃঢ়সংকল্প হলেন। বঙ্গদেশ ও বঙ্গভাষাকে সিরাজী কখনও অবহেলা করেননি, কিন্তু পরিণত বয়সে বঙ্গদেশীয় মুসলমানের কথা যত ভেবেছেন অন্য সম্প্রদায়ের মঙ্গলচিন্তায় ততটা কাতর হননি, বঙ্গভাষার সাহায্যে মুসলমানি ভাবধারা প্রচারে যতটা উদ্দীপিত বোধ করেছেন, শিল্পসৃষ্টির জন্য ততটা ব্যাকুলতা প্রকাশ করেন নি। বাঙালি নয়, বাঙালি মুসলমানের নিজস্ব সত্তার স্বরূপ আবিষ্কারের সাধনায় জীবনের দ্বিতীয়ার্ধ উৎসর্গ করেছেন। অনলপ্রবাহোত্তর সাহিত্যচর্চার মূল সুরও তাই। পোশাকে পরিচ্ছদে বক্তৃতায় ব্যংশরে প্রবন্ধে উপন্যাসে তিরিশোত্তর বয়স থেকে সিরাজী ঘোরতর রকম স্বাতন্ত্র্যপন্থী।

১৯১৩ সালে তুরস্ক ভ্রমণ প্রকাশিত হয়। ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলানের মিলন কামনা করেছেন বটে তবে তার চেয়ে বেশি জোর দিয়ে প্রচার করেছেন প্যানইসলামের কথা। সারা দুনিয়ায় মুসলমানের ভাষা যে আরবি হওয়া উচিত সে কথাও দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেছেন। ১৯১৪ সালে প্রকাশিত 'স্পেন বিজয় কাব্য' সম্ভবত তাঁর সর্বাপেক্ষা উচ্চ লক্ষ্যাভিমুখী কাব্যগ্রন্থ। এর কাহিনীর বিস্তার, চরিত্রসংখ্যার আধিক্য, ঘটনাবর্তের জটিলতা সবই মহাকাব্যের উপযুক্ত বিরাটত্ব ও বিশালত্বের ইঙ্গিত বহনকারী। লেখকের উদ্দেশ্যও ছিল অতীত গৌরবগাথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে মুসলমানকে নবজাগরণের প্রেরণা দেয়া। ভাষায়, চরিত্র-চিত্রণে ও প্রাক্তনের গতি নির্ণয়ে 'স্পেন বিজয় কাব্য' একাধিক স্থলে অর্ধশত বছর পূর্বে প্রকাশিত 'মেঘনাদবধ কাব্য' সজ্ঞানে অনুসরণ করেছে।

একটা কথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার। আমাদের উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকের এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের মুসলমান লেখকরা ইসলামি চিন্তায় যথেষ্ট

স্বকীয়তা অর্জন ও ধর্মীয় আবেগে তন্ময়তা লাভের পরও প্রকাশরীতির ক্ষেত্রে তাঁরা ব্যতিক্রমহীনভাবে তাঁদের শ্রেষ্ঠ রচনায় বাংলা সাহিত্যের প্রচলিত পুরাতন ঐতিহ্যকে আঁকড়ে ধরে রেখেছেন। সিরাজীর গদ্যের লক্ষণও সংস্কৃতানুসারিতা, দুরূহ সমাসবদ্ধ পদের দ্বারা তা কণ্টকিত, অতি দীর্ঘ বাক্যসূত্রে প্রলম্বিত। সিরাজীর গদ্যের গুরু বঙ্কিম, পদ্যের শিক্ষক হেম-নবীন, কোনো কোনো ক্ষেত্রে বৈষ্ণবীয় কবি বা মাইকেল।

সিরাজীর উপন্যাস ঐতিহ্যাসিক উপন্যাস, তবে হিন্দু গ্রন্থকারের বিপরীত মনোভাব নিয়ে রচিত।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের সূচনা থেকেই বাঙালির জাতীয়তাবাদের ধারণার সঙ্গে হিন্দু পুনর্জাগরণের আদর্শ মিশ্রিত হতে থাকে। শতাব্দীর শেষ পাদে এসে জাতীয়তাবাদ প্রায় অবিমিশ্ররূপে হিন্দু জাতীয়তাবাদে রূপান্তরিত হয়। কবি-সাহিত্যিকদেব সামাজিক সত্তা এই উগ্র মনোভাবের বিকার থেকে নিজেদেব মুক্ত রাখতে পারেনি। হেম-নবীনের কবিতা ও ভূদেব-বঙ্কিমের উপন্যাস এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। শিল্পজ্ঞানহীন নিকৃষ্ট অনুসবণকারীর সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচারে স্বভাবতই পথপ্রদর্শকদেব ছাড়িয়ে যান। উপন্যাসে মুসলমান সেনাপতি শাসনকর্তাদের অত্যাচার-অনাচাবেব চিত্র অতিবঞ্জিত কবে অঙ্কিত কবে তাঁবা জনান্তিকে ইংরেজের বিরুদ্ধে আঘাত হানতে চেয়েছেন এ কথা কেবলমাত্র অংশত সত্য। ইসলামধর্ম ও মুসলিম নরনাবীর সর্বপ্রকার লাঞ্ছনায় গ্রন্থকাবগণের ব্যক্তিগত উল্লাস সর্বত্র চাপা থাকেনি। এসব উপন্যাসে প্রায়শই দেখতে পাওয়া যায় মুসলমান চবিত্রগুলো হীনস্বভাব এবং হিন্দুগণ গুণনিধি। মুসলমান আমির-নবাব-বাদশাদেব বেটি-বহিন-বেগমবা সবাই হিন্দু নৃপতি ভূপতি-সেনাপতির শৌর্য-বীর্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁদের অঙ্গসহচবী হবাব জন্য ধর্ম-কুল-মান সব বিসর্জন দিয়েছেন। এসব উপন্যাস বরাবরই মুসলান পাঠকদেব কাছে পীড়াদায়ক ছিল। ইসমাইল হোসেন সিরাজীর প্রতিটি উপন্যাস এই প্রতিক্রিয়ার ফল। তারাবাই উপন্যাসে শিবাজীর কন্যা তারাবাই প্রেমে পড়েছে বীর সেনাপতি আফজল খাঁর, নূরউদ্দীনেব নায়িকা চিতোর রমণী, স্তরদশা প্রাপ্ত হয়েছেন যবন যুবরাজেব জন্য, ফিরোজা বেগমে মুসলমান যুবতীর জন্য লালায়িত হয়ে হিন্দু সদাশিব অসদাচবণে প্রবৃত্ত হলে তাকে উপযুক্ত শিক্ষা দান করা হয়, রায়নন্দিনীতে প্রতাপাদিত্য শঠের চূড়ামণি, কেদাব রায় মুসলমানের দুশমন। উভয়ের কন্যাদ্বয় কিন্তু কুলমানধর্মে জলাঞ্জলি দিয়ে মুসলমানকে পতিদেবতাব আসনে বসাতে চেয়েছে। রায়নন্দিনীই সিরাজীর সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় উপন্যাস। শিল্পকর্ম হিসেবে এর মূল্য বেশি নয়, তবে গ্রন্থের ভূমিকার ভাষায়, বঙ্কিমচন্দ্রের এক দাঁতভাঙ্গা জবাবের প্রচেষ্টা হিসাবে স্মরণীয়। সিরাজীর উচ্ছ্বসিত ইসলামপ্রীতির ও তাঁর গদ্যের অলঙ্কারপূর্ণ দুর্দমনীয় ওজস্বিতায় নিদর্শন স্বরূপ আমরা তাঁর রায়নন্দিনীর দুপৃষ্ঠা দীর্ঘ বাক্যটি উদ্ধৃত করলাম—

> যখন আসমুদ্র হিমাচল সমগ্র ভারতবর্ষের প্রতি নগরে, দূর্গে ও শৈলশৃঙ্গে ইসলামের অর্দ্ধচন্দ্র শোভিনী বিজয় পতাকা গর্ব্বভরে উড্ডীয়মান হইতেছিল, যখন মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের প্রখর প্রভায় বিশ্বপূজা মুসলমানের অতুল প্রতাপ ও অমিত প্রভাব দিগদিগন্ত আলোকিত, পুলকিত ও বিশোভিত কবিতেছিল, যখন মুসলমানের লোক চমকিত সৌভাগ্য ও সম্পদের বিজয়ভেরী জলদমন্দ্রে নিনাদিত হইয়া সমগ্র ভারতকে ভীত, মুগ্ধ ও বিস্মিত করিয়া তুলিয়াছিল যখন মুসলমানের শক্তিমহিমায় অনুদিন বিবৃদ্ধমান শিল্প ও বাণিজ্যে, কৃষি ও কারুকার্য্যে ভারতভূমি ধনধান্যে এবং ঋদ্ধিশ্রীতে বিমণ্ডিত

হইতেছিল, যখন প্রতি প্রভাতের মন্দ সমীরণ কুসুম-সুরভি ও বিহগ কাকলীর সঙ্গে মুসলমানে বীর্য্যশালী বাহুর নববিজয় মহিমার আনন্দসংবাদ বহন করিয়া ফিরিতেছিল, যখন মুসলমানের সমুন্নত শিক্ষা ও সভ্যতায় সুমার্জ্জিত রুচি ও নীতিতে ভারতের হিন্দুগণ শিক্ষিত ও দীক্ষিত হইয়া কৃতার্থতা ও কৃতজ্ঞতা অনুভব করিতেছিল—কৌমুদী রাশি, কুসংস্কারচ্ছন্ন শতধাবিচ্ছিন্ন তেত্রিশ কোটি দেবোপাসনার তামসী ছায়ায় সমাবৃত ভারতের প্রাচীন অধিবাসীদিগের হৃদয়ে, এক জ্যোতির্ম্ময়, আধ্যাত্মরাজ্যের দ্বার প্রদর্শন করিতেছিল, যখন মুসলমানের তেজঃপুঞ্জ মূর্ত্তি, উদারহৃদয়, প্রশস্ত বক্ষ, বীর্য্যশালী বাহু, তেজস্বী প্রকৃতি, বিশ্ব উদ্ভাসিনী প্রতিভা, কুশাগ্রসূক্ষ্ম বুদ্ধি, জ্বলন্ত চক্ষু, দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ, প্রমুক্ত করুণ, নির্ম্মল উদারতা, মুসলেমেতর জাতির মনে বিস্ময় ও ভীতি, ভক্তি ও প্রীতির সঞ্চার করিতেছিল—যখন উভয়ে শ্যাম কাননাম্বর গগনচুম্বী তুষারকিরীটি হিমগিরি তাহার গভীর মেঘনির্ঘোষে ও চপনা বিকাশে এবং দক্ষিণে অনন্ত বিস্তার ভারত সমুদ্র অনন্ত কলকল্লোল ও অনন্ত তরঙ্গবাহুর বিচিত্র ভঙ্গিমায়, মুসলমানের অবদান পরম্পরার বিশুভ্র যশোগাথা কীর্ত্তন করিতেছিল, যখন পৌরাণিক বংশমর্য্যাদাভিমানী চন্দ্র, সূর্য্য, অনল বংশীয় এবং রাঠোর ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, শত, রাজপুত, জাঠ গোত্রীয় অসংখ্য জাতি, মহিমান্বিত মুসলমানের গিরিশৃঙ্গ বিদলনকারী চরণতলে ভূনত জানু ও বিনত মস্তক হইতে কুণ্ঠার পরিবর্তে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিতেছিল, যখন নগরীকুলসম্রাজ্ঞী বিপুল বীর্য্য ও ঐশ্বর্য্যশালিনী দিল্লীব তখ্‌তে অধ্যাবসায়র অবতার প্রোথিতযশা আকবর শাহ্ উপবেশন করিয়া স্বকীয় প্রভাব বিস্তার করিতেছিল—যখন বীর পুরুষ দায়ুদ খাঁ, সুজলা সুফলা হিন্দুস্তানের রম্য উদ্যান বঙ্গভূমির রাজধানী দিল্লীর গৌস্পর্দ্ধিনী গৌড় নগরীতে রাজত্ব করিতেছিলেন সেই সময় রক্ষীসহ একখানি পাল্‌কী আসিয়া উপস্থিত হই।

১৯৩১ সালের ১৭ই জুলাই দুরারোগ্য পৃষ্ঠব্রণ রোগে মাত্র বাহান্ন বছর বয়সে সিরাজী এন্তেকাল করেন। প্রায় সারা জীবনই তাঁকে প্রতিকূল অবস্থাব সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত থাকতে হয়। কখনও-কখনও যে হতাশাচ্ছন্ন না হয়েছেন তা নয়। তবে সিরাজীর নিরাশা প্রকাশেব ভঙ্গীও বীরত্বব্যঞ্জক। জীবনী-লেখক জনাব সিরাজুল হককে কোনো এক পত্রে লেখেন, 'অসাধাবণ শক্তি ও প্রতিভা লইয়া কর্দমে পতিত সিংহের ন্যায় জীবনযাপন করিতেছি'। সিরাজীর সমগ্র জীবন তাঁর কোনো একটি বিশিষ্ট এলাকার কীর্তির চেয়ে মহৎ ছিল। ধর্ম ও সমাজের সংস্কার সাধন, ব্যাপকভাবে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন, সংবাদপত্র পরিচালনা, সভাসমিতিতে বক্তৃতা দান, জনসেবায় আত্মনিয়োগ, শিল্পসাহিত্যের চর্চায় একনিষ্ঠ থাকা, মরহুম সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী ব্যক্তিত্বের বিকাশ ছিল বিচিত্রমুখী। তাঁর মৃত্যুতে বঙ্গদেশী হিন্দু-মুসলমান সম্মিলিতভাবে শোকাশ্রু বিসর্জন করে।

গোলাম মোস্তফার চিন্তাধারা ও গদ্যরীতি

মরহুম গোলাম মোস্তফার সম্পূর্ণ নাম কবি গোলাম মোস্তফা। লোকের স্মৃতিতে 'কবি' তাঁর নামের অবিচ্ছেদ্য আদ্যাংশ রূপে চিরকাল জাগরুক থাকবে। কিন্তু তাঁর সমগ্র সাহিত্য-কীর্তির বিচারে এই পরিচয় অসম্পূর্ণ, কবির গদ্য রচনার গুণ ও পরিমাণ কোনা অর্থেই সামান্য নয়। এমন কি এই গদ্যের কবিত্বপূর্ণ এক বিশেষ ওজস্বিতার তারিফ করেই যাঁরা ক্ষান্ত হন তাঁরাও সুবিচার করেন এমন বলতে পারি না। কারণ গোলাম মোস্তফার গদ্য যে কেবল কাব্যিক উদ্দামতায় বেগবান তাই নয়, এই গদ্য, পরিণত চিন্তাধারার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে সরস, শাণিত ও সংহত রূপ পরিগ্রহ করতে সক্ষম। আমাদের সৌভাগ্যবশত কবির জীবৎকালে প্রকাশিত সর্বশেষ গদ্যগ্রন্থ 'আমার চিন্তাধারা' নামক প্রবন্ধ সংগ্রহে মননশীল গোলাম মোস্তফার ঐশ্বর্যময় চিন্তালোকের এক অন্তরঙ্গ প্রতিকৃতি সংরক্ষিত হয়। ১৯৯৭ সাল থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত শিল্প-শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে কবি যে সকল মতামত ক্ষুদ্র বৃহৎ নিবন্ধের আকারে প্রকাশ করেন, এই বই তার সুনির্বাচিত সংকলন। কালের প্রবাহের সঙ্গে কবির চিন্তার বিবর্তন যে বিচিত্র পথে বিকাশ লাভ করে, তার আনন্দময় স্বাক্ষর বহন করে গদ্যও বিচিত্র ভঙ্গীতে ক্রীড়াশীল হয়ে ওঠার অধিকার অর্জন করেছে।

কবির গদ্য কোমল হয়, মধুর হয়, ললিত হয়, এই রকমই আমরা প্রত্যাশা করি। তার ওপর কবি গোলাম মোস্তফা ছিলেন আদর্শবাদী কবি; মহৎ ভাবনার বহুল প্রচারের জন্য তিনি বাণীকে ছন্দোবদ্ধ করতে প্রয়াসী হন। কিন্তু পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব একক স্রোতের ধারক হয় না। মানবকল্যাণ সাধনের অভিপ্রায়ের সঙ্গে সৌন্দর্যপ্রীতির মিলন সংগঠিত হয়; ধর্মানুপ্রেরণার সামাজিক কাণ্ডজ্ঞান মিশ্রিত থাকে; কাব্যানুভূতির সঙ্গে সতেজ রঙ্গরসপ্রিয়তার সমাবেশ ঘটে। লঘু-গুরুর এই মনোমুগ্ধকর সংমিশ্রণই পরিণত চরিত্রকে প্রাণপ্রিয় করে তোলে। স্বভাবের এই তারুণ্য মর্যাদাবান চিন্তার প্রকাশকে কতখানি দ্যুতিময় করে তার এক স্মরণীয় দৃষ্টান্ত কবির একটি অতি পুরাতন রচনা 'কবি ও বৈজ্ঞানিক'। প্রবন্ধকারের মতে :

> বৈজ্ঞানিক আসিয়া কবির কল্পনাপথ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়াছে; তার সমস্ত স্বপ্নসৌধ সে ভাঙ্গিয়া দিতেছে। কবি এতদিন অবাধে আকাশ-ভুবনের সর্বত্র বিহার করিয়া ফিরিত, কিন্তু বৈজ্ঞানিক আসিয়া তাহার সে সাধে বাদ সাধিয়াছে। প্রেয়সীর নয়ন-কোণে বিরহের অশ্রুবিন্দু দেখিয়া কবি মুক্তাবিন্দু জ্ঞানে সেগুলিকে প্রেম-সূত্রে গ্রথিত করিয়া প্রিয়ার কণ্ঠে পরাইয়া দিতে যাইতেছিল, অমনি বৈজ্ঞানিক আসিয়া সেই অশ্রুমালাকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়া দিল, উহা মুক্তা নহে—উহা দুই ভাগ হাইড্রোজেন ও একভাগ অক্সিজেন মাত্র। কবি ফুলবাগানে ফুলের মধ্যে ফুলরাণীকে খুঁজিয়া ফিরিতেছিল, অমনি বৈজ্ঞানিক আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল এবং শাণিত অস্ত্র দ্বারা ফুলের পাপড়িগুলিকে কাটিয়া উদ্ভিদতত্ত্বের গবেষণা শুরু করিল। নিশীথের অন্ধকারে পূর্ণ চাঁদ ও তরকামণ্ডলী দেখিয়া কবি নন্দনকাননের শোভা দেখিতেছিল, বৈজ্ঞানিক

আসিয়া অমনি সেই চাঁদে গভীর খাত ও কঠিন পাহাড় আবিষ্কার করিল আর তারাগুলোকে এক একটা গ্রহ-উপগ্রহ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া কবিকে একদম বেকুফ বানাইয়া ছাড়িল! ... বৈজ্ঞানিক কলকারখানার বিকট গর্জনে আজ কোকিল-পাপিয়া দেশ ছাড়িয়াছে, আলোর নাচন স্তব্ধ হইয়াছে, সব সুর, সব ইংগিত থামিয়া গিয়াছে। ... কিন্তু প্রকৃতিও সহজ পাত্রী নহে। বৈজ্ঞানিকের ওপর সেও হাড়ে হাড়ে চটিয়া গিয়াছে। সময়ে সময়ে সেও প্লাবন ভূমিকম্প ঝটিকা ঘূর্ণিবাত্যা ইত্যাদি মারণযন্ত্র দ্বারা বৈজ্ঞানিকের সকল প্রয়াসকে ব্যর্থ করিয়া দিতেছে। ... তাই আমরা দেখিতে পাই যুগে যুগে একজন খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকের আবির্ভাব হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতিও এক একজন খ্যাতনামা কবিকে পাঠাইয়া দিয়াছে। টমসনের পাশে পোপ, নিউটনের পাশে মিলটন, জগদীশচন্দ্রের পাশে রবীন্দ্রনাথ এ কথার সাক্ষ্য দিবে। এমনও ঘটিতেছে যে, কোনো কোনো বৈজ্ঞানিকের মধ্যেই কবির জন্ম হইতেছে। ওমর খৈয়াম তাহার সুন্দর দৃষ্টান্ত। প্রকৃতির কী অপরূপ প্রতিশোধ!

এই ভাষা অন্তর্নিহিত ভাবের মতোই সংযত ও পরিচ্ছন্ন। উচ্ছ্বাসে বেসামাল নয়, অতি কাব্যিকতায় বিগলিত হয়ে ওঠেনি। চিন্তার স্তরক্রমকে অনুসরণ কর বাক্য হ্রস্বদীর্ঘ আকার নিয়েছে, কমা-সেমিকোলনে সচেতন প্রয়োগে ভাবের গ্রন্থি বন্ধন সুদৃঢ় হয়েছে। শব্দ চয়ন করেছেন অর্থের চেতনা ও ছন্দের কান একত্রে সজাগ রেখে। কোনো কোনো শব্দ বা বাক্যাংশের কৌশলময় সচেতন প্রয়োগ পূর্বতন ব্যবহারের যে ভাবানুষঙ্গ জাগরিত করে তার প্রভাবে সমগ্র পরিচ্ছেদের বর্তমান আবেদন গাঢ়তর হয়। পরবর্তীকালের যে সকল প্রবন্ধ তুলনামূলকভাবে অধিকতর তত্ত্ব ও তথ্যের সমারোহে সমৃদ্ধ, সেখানেও গোলাম মোস্তফার ভাষা এক সহজ ও স্বচ্ছন্দ গদ্যরীতির কারুকলায় মণ্ডিত।

বিশ্বাস, বিশেষত ধর্মবিশ্বাস, গোলাম মোস্তফার চিন্তার ভিত্তিভূমি। জগৎ ও জীবনের প্রতিটি সত্য সম্পর্কে তাঁর ধারণা প্রগাঢ়, ইসলামি ভাবধারায় সম্পৃক্ত। তাঁর সাহিত্যাদর্শও এই বিশ্বাসের উপফল। এই তত্ত্বাশ্রিত মন্ময় দৃষ্টি তাঁর সাহিত্য বিচারকেও নিয়ন্ত্রিত করে। তবে গতানুগতিক চিন্তাহীন ধর্মীয় আবেগ প্রকাশের সঙ্গে এর বড় পার্থক্য এই যে, মোস্তফা-মানসের অভিব্যক্তি উদার, জ্ঞানময় এবং সুশৃংখল। তিনি ছিলেন রুচিবান এবং নিজস্ব পরিমণ্ডলের মধ্যে বিদগ্ধ, রবীন্দ্রনাথ-মাইকেল-ইকবালের অনিসন্ধিৎসু পাঠক মরহুম গোলাম মোস্তফা আধুনিক যুগচেতনার সংঘটক ইউরোপীয় কবি-সমালোচক-দার্শনিকদের রচনার সঙ্গে পরিচিত হতে আন্তরিকভাবে সচেষ্ট ছিলেন। আমাদের প্রবীণ কবিদের মধ্যে জ্ঞানচর্চার এই স্পৃহা, নিজের ভাবমার্গীয় উপলব্ধিকে বুদ্ধিবৃত্তির সযত্ন অনুশীলনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করার প্রবণতা দুর্লভ। তবে, চেতনা বিশ্বাসে আলোকিত বলে গোলাম মোস্তফার সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক সিদ্ধান্তসমূহ, আমাদের দৃষ্টিতে, কখনও-কখনও অনাবশ্যক রূপে সরল, সংশয়হীন। আত্মপ্রত্যয়ে সমুজ্জ্বল, অন্তঃকরণে তিনি প্রত্যক্ষ করেন : মুসলিম কালচার অর্থে আমরা সেমেটিক কালচারকেই বুঝি, 'বাংলা ভাষা মূলত দ্রাবিড় ভাষা, এবং যেহেতু দ্রাবিড় ভাষা, সেই হেতু সেমেটিক', যে কারণে ইকবাল প্লেটো বা হাফিজকে আমল দেন নাই, ঠিক সেই কারণে আমরা রবীন্দ্রকাব্যকেও আমল দিতে পারি না ইত্যাদি। অন্তরের মলিনতামুক্ত স্বজাতি, স্বদেশ ও স্বজিলা প্রীতির আতিশয্যে তিনি কখনও-কখনও একেবারেই আত্মহারা হয়ে পড়েন। যেমন, যশোর বন্দনার তুংগে আরোহণ করে বলেন,

পূর্বপাকিস্তানের অন্যতম প্রিন্টিং প্রেস প্যারামাউন্ট প্রেস যশোরের প্রতিষ্ঠান, একমাত্র বাঙালি মুসলিম চিত্রতারকা বনানী চৌধুরীও যশোরের মেয়ে। অবশ্য বেশির ভাগ ক্ষেত্রে, সমগ্র প্রবন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে এইসব উক্তির সারবত্তা পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, প্রবন্ধকার নিজের মতের সমর্থনে যে সকল যুক্তি ও তথ্যের অবতারণা করেন তা স্বল্প শ্রমের ফল নয়, রবীন্দ্রকাব্যে ইসলামি ভাবনার প্রকৃতি বোঝাতে গিয়ে তিনি মামুলি মত প্রকাশ করেই ক্ষান্ত হন নি, তুলনা দানের জন্য একাধিক সুরা থেকে আয়াতের নির্দেশ দান করেন; ইকবালের দার্শনিকতার স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের দর্শনসমুদ্র মন্থন করেন। যুক্তিজাল বিস্তারের জাগ্রত মুহূর্তে তিনি নিটোল রসোজ্জ্বল প্রবাচনিক উক্তি প্রস্তুত করতে বিশেষভাবে সমর্থ। যেমন, সত্যিকারের কাব্য হতে হলে তাতে কিন্তু দার্শনিকতা থাকা চাই; শ্রেষ্ঠ কাব্য দুর্বোধ্য হতে পারে, কিন্তু দুর্বোধ্য হলেই শ্রেষ্ঠ কাব্য হয় না; জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টি করিতে হইলে তার অর্থ কী, উদ্দেশ্য কী, লক্ষ্য কী হইবে সেই বিষয়ে সর্বাগ্রে আমাদিগকে অবহিত হইতে হইবে। নতুবা রাশি রাশি আরবি-ফারসি শব্দ ঢুকাইলেও, অথবা স-কে-হ দিয়া লিখিলেও জাতীয় সাহিত্য গড়িয়া উঠিবে না, ইত্যাদি। মাইকেল মধুসূদন দত্তের তারিফ করতে গিয়ে বলেন, 'তুমি শুধু যশোরের নও—পাকিস্তানের। ... ... কবি হিন্দু না মুসলমান না খ্রিস্টান—সে প্রশ্ন কেউ করে না। সত্য ও সুন্দর এমনি করে ব্যক্তি সমাজ ও দেশের গণ্ডী পেরিয়ে গিয়ে বিশ্বজনীন হয়। তাজমহল আজ আর শাহ্‌জাহানের নয়—সারা জাহানের। ব্যক্তির চিন্তা ও শিল্প সৃষ্টি এমনি করে বিশ্বমানুষের মনে প্রতিনিধিত্ব করে। সেই জন্যই ত হোমার, ভার্জিল, বাল্মিকী, সাদী, হাফিজ, রুমী, দান্তে, মিলটন্, শেকস্‌পিয়ার, রবীন্দ্রনাথ, ইকবাল সবাই আজ বিশ্বকবি।'

অত্যাধুনিক বিচারে মোস্তফা-মানস পুরাতন চিন্তাধারার স্ববিরোধিতা ও সীমাবদ্ধতার প্রতীক বলে পরিগণিত হলেও তাকে অনুদার বা সংকীর্ণ বলে চিহ্নিত করা অসংগত হবে। কর্ম ও জ্ঞানের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার পরিপুষ্ট এই চেতনা ব্যাপক সহানুভূতি ও দূরদৃষ্টির অধিকারী ছিল, নিজের কালের রুচি-শিক্ষা-আদর্শের সংগে হালের দুস্তর ব্যবধান সম্পর্কে তিনি খুবই সচেতন ছিলেন। সেই উপলব্ধির পরিণত বেদনা যে উদার আবেগোষ্ণ অন্তরঙ্গতার সঙ্গে তিনি ব্যক্ত করেছেন তা যেন মৃত্যুর পরপার থেকে ভেসে আসা কোনো অমর মহাকবির বাণীর মতোই চিরকাল আমাদের আত্মপরীক্ষায় উদ্বুদ্ধ করবে, সেই বাণী উদ্ধৃত করেই আমরা মরহুম গোলাম মোস্তফার স্মৃতি উদযাপন সম্পূর্ণ করি :

> তরুণ ও পুরাতনের মধ্যে দ্বন্দ্বই বা কোথায় ? কে তরুণ ? কে পুরাণ ? তরুণ ও পুরাতনের ডেফিনিশন কী ? কোথায় উহাদের সীমারেখা ? কোথায় উহাদের লাইন অব ডিমারকেশন ? এই একটানা জীবনস্রোতের কোনখানিকে আধুনিক, আর কোনখানিকে প্রাচীন বলিব ? এই মুহূর্তে যে নূতন, পর মুহূর্তেই সে যখন পুরাতন, তখন পুরাতনকে গালাগাল দেওয়া কি নূতনের শোভা পায় ?

ওয়ালীউল্লাহ্‌র গদ্যরীতি

আমাদের আধুনিক লেখকগণ গ্রামজীবনের কাহিনীতে অনেক গ্রামের কথা ব্যবহার করেন। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ ও শহীদুল্লা কায়সার নোয়াখালী, শামসুদ্দীন আবুল কালাম বরিশালের, শাহেদ আলী সিলেটের, আবু ইসহাক বিক্রমপুরের, আলাউদ্দীন আল-আজাদ ও শওকত ওসমান চট্টগ্রামের এবং হাসান আজিজুল হক কুষ্টিয়ার আঞ্চলিক ভাষা ও ডায়ালেক্‌ট প্রচুর পরিমাণে তাঁদের রচনায় গ্রহণ করছেন। অধিকাংশ স্থলে পূর্ববঙ্গীয় উপভাষা কেবল সংলাপে বাস্তবতা সম্পাদনের জন্য গৃহীত হয়। এই রীতি বাঙলা ভাষায় শতবর্ষ পুরাতন। তবে এর মধ্যে যা নতুন তা হলো এই যে, কেউ কেউ, অজ্ঞতা বা স্বভাববশত নয়, স্বেচ্ছায় ও সচেতনভাবে, কেবল সংলাপে নয়, কাহিনী বর্ণনার কালেও স্থল বিশেষে পূর্বাঞ্চলিক শব্দ বা শব্দ-সমষ্টি বা বাক্‌ভঙ্গী চমৎকার চমৎকার বিশিষ্টার্থে প্রয়োগ করেছেন। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র চাঁদের অমাবস্যা (১৯৬৪) ও দুই তীর (১৯৬৫), আলাউদ্দীন আল-আজাদের কর্ণফুলী (১৯৬২) ও ক্ষুধা ও আশা (১৯৬৪), শাহেদ আলীর একই সমতলে (১৯৬৩) এবং শহীদুল্লা কায়সারের সারেং বৌ (১৯৬৩) গ্রন্থাদিতে আমাদের গদ্যরীতি উৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যাবে। তবে আঞ্চলিকতা এঁদের রচনার মুখ্য আকর্ষণ নয়, গ্রাম্যতাও এঁদের স্বভাবের মুখ্য বৈশিষ্ট্য নয়। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ দীর্ঘকাল ধরে ইয়োরোপে বসবাস করতেন, পত্নী ফরাসি দেশীয়, মৃত্যুবরণ করেন প্যারিসে। শামসুদ্দীন আবুল কালাম দেশত্যাগ করেন সম্ভবত পনের-ষোল বছর আগে, এখনও ইতালিতেই রয়েছেন। শওকত ওসমান ও আলাউদ্দীন আল-আজাদ উভয়ের পেশাই অধ্যাপনা এবং উভয়ের চিন্তাধারাই আধুনিক বিশ্বভাবনার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শাহেদ আলীও বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম ডিগ্রির অধিকারী, অধ্যাপনা করেছেন, সম্পাদক ও গবেষকও বটে। সাংবাদিক শহীদুল্লা বস্তুবাদী সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধার অনুশীলন করেছেন এবং সাংবাদিক হিসাবে বহু দেশ পর্যটন করেছেন। এই সব আধুনিক শিল্পীদের মানস-প্রকৃতি সৃষ্টিধর্মী প্রতিভার সঙ্গে মননশীল নাগরিকতার সমন্বয়ে গঠিত। এ কথা না বুঝলে এঁদের রচনারীতির মূল সূত্রসমূহ সনাক্ত করা সম্ভবপর হবে না।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ সংলাপে পূর্বাঞ্চলিক উপভাষা ব্যবহার করেছেন। লাল সালুতে নোয়াখালী ও ময়মনসিংহ উভয় জিলার গ্রাম্য বুলির নজির মিলবে।

(ক) ও যখন উঠানে হাঁটে তখন মজিদ চেয়ে চেয়ে দেখে। তারপর মধুর হেসে আস্তে আস্তে নেড়ে বলে,—অমন করি হাঁটতে নাই।

থমকে গিয়ে রহিমা তার দিকে তাকায়।

মজিদ বলে,

—অমন করি হাঁটতে নাই বিবি, মাটি—এ পোস্বা করে। এ মাটিতেই ত একদিন ফিরি যাইবা—থেমে আবার বলে, মাটিরে কষ্ট দেওন গুনাহ্‌।

(খ) — কী গো ধলা মিয়া, বুঝলান নি আমার কথাডা ?

প্রথম সংলাপে ক্রিয়াপদের অসমাপিকায় করি ফিরির ব্যবহার ও ই-স্বরান্ত নামপদের কর্তৃকারকে এ-বিভক্তির প্রয়োগ নোয়াখালী বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক, বুঝলান নি পদের সংগঠন ময়মনসিংহের। আঞ্চলিক বুলির সামান্যতম হেরফের সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র কানে কত সুস্পষ্টরূপে ধ্বনিত হত উপরোক্ত প্রয়োগ তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। তবে, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, কি কাহিনী গ্রন্থনে, কি চরিত্র সৃজনে, জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত কিম্বা জীবনোপলব্ধির ভাষাগত রূপায়ণে কখনই বাস্তবতা অনুকারী ছিলেন না। তাঁর সংলাপও অঞ্চলবিশেষের মুখের ভাষার হুবহু প্রতিফলন নয়। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল বঙ্কিম, উপলব্ধি জটিলতাপূর্ণ। তাঁর ভাষ্য তাঁর চেতনার মতই বহুমাত্রিক। বর্ণনাগুণে তাঁর গল্পের অতি চেনা স্থূল পরিবেশ সূক্ষ্ম সরসতা প্রাপ্ত হয়, সত্য হয়েও কল্পলোকের প্রান্তসীমা স্পর্শ করে। পূর্ববাঙলার গ্রাম, তার মানুষ, তাদের অনুভূতিকে বৃহত্তর দুর্জ্ঞেয় জীবনরহস্যের প্রতীকে পরিণত হয়। ওয়ালীউল্লাহ্‌র ভাষা এই ভাবেরই বাহন। আঞ্চলিক বুলিকে তিনি সরাসরি গ্রহণ করেননি। তাকে ইচ্ছানুযায়ী ভেঙেছেন, গড়েছেন। স্বাধীনতা শিল্পীর। কোনো শব্দ রেখেছেন, কোনো শব্দ বর্জন করেছেন। সংলাপের এক অংশ হয়ত সাধু ও শালীন, অন্য অংশ আঞ্চলিক ও অসংস্কৃত। কিছু রক্ষা করেছেন আবহ সৃষ্টির জন্য, কিছু সংযোজন করেছেন তাকে কলামণ্ডিত করে তোলার উদ্দেশ্যে। বর্ণনায় যেখানে ক্রিয়াপদের চলিত রূপটি শুদ্ধ ও স্বাভাবিক বলে বিবেচিত হতে পারত সেখানে হয়ত সাধুরূপটি প্রয়োগ করেছেন। যেমন,

> "শীতের উজ্জ্বল জ্যোৎস্না রাত তখনও কুয়াশা নাবে নাই। বাঁশ ঝাড়ে তাই অন্ধকারটা তেমন জমজমাট নয়। সেখানে আলো অন্ধকারের মধ্যে যুবক শিক্ষক একটি অর্ধ-উলঙ্গ মৃতদেহ দেখতে পায়। অবশ্য কথাটা বুঝতে তার একটু দেরী লেগেছে, কারণ তা ঝট্ করে বোঝা সহজ নয়। পায়ের ওপর এক ঝলক চাঁদের আলো। শুয়েও শুয়ে নাই। তারপর কোথায় তীব্রভাবে বাঁশি বাজতে শুরু করে। যুবতী নারীর হাত-পা নড়ে না। তারপর বাঁশির আওয়াজ তীব্র হওয়ে ওঠে। অবশ্য বাঁশির আওয়াজ সে শোনে নাই।'

সংলাপ যেখানে মূলত আঞ্চলিক সেখানেও এই কৌশলের প্রয়োগ লক্ষ করা যাবে। আঞ্চলিক ভাষার সাহিত্যিক রূপায়ণের সমস্যা সম্পর্কে ওয়ালীউল্লাহ্‌র চেতনা ছিল অতিশয় সজাগ। এ বিষয়ে তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষারও অন্ত ছিল না।

কখনও কোনো বিশিষ্ট পদের অকৃত্রিম আঞ্চলিকতা অটুট রেখেও সমগ্র বাক্যটি গঠন করেছেন পরিমার্জিত সাহিত্যিক গদ্যরীতির আদলে। আবার কখনও হয়ত আদ্যোপান্ত বিশুদ্ধ বাঙলা বাকপ্রবাহের মধ্যে এমন এক ঔপভাষিক ছন্দোস্রোত অলক্ষ্যে সঞ্চালিত করেছেন যা সন্দেহাতীতরূপে পূর্ববঙ্গীয়। এই প্রবণতারই চূড়ান্ত প্রকাশ বহিপীরের মুখ্য চরিত্রের মুখের ভাষায় :

> 'আপনি লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, আমি কথাবার্তা বিলকুল বহির ভাষাতেই করিয়া থাকি। ইহার একটি হেতু আছে। দেশের নানা স্থানে আমার মুরিদান। একেক স্থানে একক ঢঙ্গের জবান চালু। এক স্থানের জবান অন্য স্থানে বোধগম্য হয় না, হইলেও হাস্যকর ঠেকে। আমি আর কি করি। আমাকে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম সব দিকেই যাইতে হয়, আমি আর কত ভাষা বলিতে পারি। সে সমস্যার সমাধান করিবার জন্যই আমি বহির ভাষা রপ্ত করিয়া সে ভাষাতেই আলাপ-আলোচনা কথাবার্তা করিয়া থাকি। বহির ভাষাই আমার একমাত্র জবান। তাছাড়া কথ্য ভাষা আমার কানে কটু ঠেকে।

মনে হয় তাহাতে পবিত্রতা নাই, গাম্ভীর্য নাই। আমার কর্তব্য মানুষের কাছে খোদার বাণী পৌঁছাইয়া দেওয়া। উক্ত কার্যের জন্য পুস্তকের ভাষার মতো পবিত্র ও গম্ভীর আর কোনো ভাষা নাই। কথ্য ভাষা হইল মাঠ-ঘাটের ভাষা, খোদার বাণী বহন করার উপযুক্ততা তাহার নাই।"

সংলাপ ছাড়াও সাধারণ বর্ণনার অনেক স্থলে সৈয়দ ওয়ালউল্লাহ্ পূর্বাঞ্চলিক শব্দ ও বাক্‌ভঙ্গী সচেতনভাবে প্রয়োগ করেন। যেমন, যুক্ত ক্রিয়াপদ 'ঘ্রাণ করে', সমাসবদ্ধ পদ 'ঘরাভিমুখে', তল্ শব্দের সঙ্গে আয়-বিভক্তির পরিবর্তে এ-বিভক্তির সংযোগে, 'ঘরের পিছনে জামগাছ, তারই তলে শারীরিক প্রয়োজন মিটিয়ে সে ঘরে ফিরবে'। না-অব্যয় ক্রিয়ার পূর্বে স্থাপন করে গল্পের নামকরণ হয় 'না কান্দে বুবু'। আখ্যান বর্ণনার ভাষা হয় বিস্ময়কররূপে সহজ সরল, পদে-পদে পূর্ববঙ্গীয় গ্রামজীবনের সহস্র উপকরণের স্মৃতিবাহী ; পরতে পরতে লীলায়িত হয় স্থানীয় বাসিন্দাদের মুখের ভাষার মোহময় ছন্দ :

"বুবু কাঁদে শুধু, বুবু জানে না। নদীর বাঁকের পর কী আছে বুবু জানে না। বুবু মুরগির খোয়াঁড়ে ঝাঁপ দিতে জানে, গরুর পেটের দাওয়াই জানে, কিন্তু বুবু জানে না শহরের সোনা ভাইয়ের মনের কথা। বুকের মধ্যে বুবুর দুঃখের দরিয়া. বুবু জানে না নদী কতদূর যায়। বাপ বলে ছানি নাই চোখে। বুবু বলে ছানি নাই চোখে।"

"আফতাব মিয়ার পেটে জোর নেই সিদ্ধ ভাত খেয়ে। একটু নুন, একটু মরিচ, একটু মাছ। গাড়ি-ঘোড়ায় চড়ে না। সে রঙ্গে নাই। রনকদার শহরে রঙ্গে নাই।

"বুবু কাঁদে না। বুবু গোয়াল ঘরে কাঁদে না, চুলার আগুনের পাশে কাঁদে না, ঘরে কাঁদে না। তেজ নাই চলনে-বলনে, বুবু কাঁদেও না; সেনা সোনা ভাইটা দেশে ফিরেছে। বুবু কাঁদে না। বুবু নীরবে শাড়ির জমিন দেখে হাত নিচে রেখে, বুবু কাঁদে না।"

এইটেই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর বর্ণনারীতির বৈশিষ্ট্য, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির তীর্যকতার অভিব্যক্তি। কাহিনীর চেয়ে তাঁর গল্পে মুখ্য হয়ে ওঠে অনুভবের লীলা, চেতনা-প্রবাহের রহস্যময় বিচিত্র গতি। যা প্রত্যক্ষত দৃষ্টিগোচর তাকে অতিক্রম করে তাঁর বর্ণনা বিস্তৃত হয় পরিপার্শ্বের সঙ্গত-অসঙ্গত স্বচ্ছ-অনচ্ছ লঘু-গুরু বহুবিধ সংকেতকে আশ্রয় করে। তাঁর তুলনা-উপমাও উদ্ভাবিত হয় বিষয়ের বস্তুগত পরিচয়কে কেন্দ্র করে নয়, তার অন্তর্নিহিত কোনো অব্যক্ত ভাবাবহের প্রান্ত স্পর্শ করে। যেমন,

"রাস্তার ধারে ধূলোভারাচ্ছন্ন বৈঠকখানায় বসে খান বাহাদুর মোত্তালেব সাহেব ভাবেন। ভাবেন যে সে-কথা তাঁর চোখের দিকে তাকালেই বোঝা যায়। চোখের নিচে মাংসের থলে। বড় গোছের চোখ দুটো তার মধ্যে ভারী দেখায়। অনেকটা মার্বেলের মতো। তাও ড্রেনের কোণে হারিয়ে যাওয়া নিশ্চল মার্বেল।" —(পাগড়ী)

বর্ণনার মধ্যে স্থানীয় বাক্‌রীতি ও সামাজিক শব্দের কৌশলময় প্রক্ষেপণ শিল্পীর সুগভীর বাস্তব অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত বেদনা ও কৌতুকবোধের মিশ্রিত আবেগকে জাজ্বল্যমান করে তোলে—

"মেয়েরা চোখ মুছতে মুছতে বাইরের ঘরে ছুটে যায়। লজ্জায় তারা কেমন মুষড়ে পড়েছে। তারা বিড়বিড় করে অনুচ্চ কণ্ঠে বলে, ছি, ছি, কী ঘুমই পেয়েছিল। বাদলার দিন কি না। বারবার সে কথাই বলে চলে দোয়াদরুদের মতো। ছেলেরা কিছু না বলে মাথা চুলকায়। মেজো ছেলেটির পাছার কাছে পাঁচড়ার জন্য মারাত্মকভাবে চুলবুল করে। কিন্তু তবু সে তার মাথাই চুলকায়।" —(পাগড়ী)

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র স্বীয় গদ্যরীতির উন্মেষ তার ছোটগল্প, পূর্ণ পরিণতি তাঁর উপন্যাসদ্বয় 'চাঁদের অমাবশ্যা' ও 'কাঁদো নদী কাঁদো'-তে। শেষোক্ত উপন্যাস থেকে দুটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করে আমরা ওয়ালীউল্লাহ্‌র গদ্যরীতি সম্পর্কে আমাদের আলোচনা শেষ করছি।

(ক) "কারণে অকারণে মুহাম্মদ মুস্তফার মনে ভয় দেখা দিত। একবার গ্রামের হামজা মিঞা নামক মোল্লা-মৌলভী গোছের একটি লোকের কথায় ভীষণ ভয় দেখা দিয়েছিল তার মনে। লোকটি বলত, ঈমান মুফাচ্ছাল বাল্য বয়সেই পাকা হওয়া উচিত। একদিন মোহাম্মদ মুস্তফাকে হাতে পেয়ে নিজের শীর্ণ উরুতে বাঘা থাবা মেরে ব্যাঘ্র কণ্ঠে হুঙ্কার দিয়ে প্রশ্ন করেছিল : খোদা ভিন্ন কী মা'বুদ আছে, ত'ার সমতুল্য কেউ কি আছে, তাঁর কি কোনো শরিক বা প্রতিদ্বন্দ্বী আছে, তাঁর নিদ্রা-তন্দ্রা আছে, ক্ষুধা আছে, তৃষ্ণা আছে, ক্লান্তি-ক্ষয় আছে? সে-সব প্রশ্নে কী ছিল, বা বালক-মনে কী চিত্র জাগিয়ে তুলেছিল কে জানে। কিন্তু হামজা মিঞার প্রশ্নের গোলাগুলি শেষ হবার আগেই মুহাম্মদ মুস্তফা অজানা ভয়ে সমগ্র অন্তরে হিমশীতল হয়ে পড়ে। তার মনে হয় আকাশ অন্ধকার করে কেয়ামতি ঝড়-তুফান আসতে দেরী নাই, শীঘ্র কোথাও সহস্রাধিক হিংস্র ক্রুদ্ধ সিংহও কান বধির করা আওয়াজে গর্জন করা শুরু করবে। চোখ বুজে সে ছুটে পালিয়ে গিয়েছিল। পরে একটি নির্বোধ মেয়েমানুষের কাছে শুনতে পায়, খোদা নাকি দেখতে কলিজার মতো প্রতি মুহূর্তে থরথর করে কাঁপে। কথাটি কী কারণে তাকে আশ্বস্ত করে এবং যদিও তার মনে হয় আকাশে ভাসমান অদৃশ্য সে-কলিজার কাঁপুনিতে গোটা পৃথিবী থরথর করে কাঁপতে শুরু করেছে, তার দুর্বোধ্য ভয়টি কিছু প্রশমিত হয়।"

(খ) "অকস্মাৎ একদিন একটি বিচিত্র কান্নার আওয়াজ শোনার পরও সকিনা খাতুনের মধ্যে কোনো পরিবর্তন দেখা দেয় না বা তার নিত্যনৈমিত্তিক কর্মজীবনে কোনো ব্যতিক্রম ঘটে না ; পূর্বের মতো সে যথাবিধি স্কুলে যায়, বিবিধ সাংসারিক দায়িত্ব নিপুণ হস্তে নির্বাহ করে চলে, যেন সে-কান্নার ধ্বনি থেকে থেকে শুনতে পায় তা হাওয়ার গোঙানি মাত্র ; হাওয়ার গোঙানি মানুষের জীবনধারায় টোল ফেলে না, তার পদক্ষেপ মুহূর্তের জন্যেও শ্লথ করে না। কখনো কখনো নিজেই বুঝতে পারে, বিচিত্র দুর্বোধ্য কান্নাকাটির জন্য সে অপেক্ষা করছে। কিন্তু মানুষ তারই অজান্তে অলক্ষিতে কত সময়ে কত কিছুর জন্য অপেক্ষা করে, মেঘ-সঞ্চারের জন্য, যে ফিরিওয়ালার কাছে কেনবার নেই সে ফিরিওয়ালারও ডাকের জন্য, অকস্মাৎ কোথাও একটি হাসি বা শুধুমাত্র একটি কণ্ঠস্বর শোনার জন্যে। তারপর আপদ-বিপদের জন্য অপেক্ষা করে : রোগব্যাধি দুঃখ-কষ্টের জন্যে বন্যা দুর্ভিক্ষ মহামারীর জন্যে, সর্বশান্ত করা অগ্নিকাণ্ডের জন্যে, মৃত্যুর জন্যে, কেয়ামতের জন্যে। দুনিয়া একটি সুনিয়ন্ত্রিত চক্রে আবর্তিত হয় জেনেও যে-সব ঘটনা ঘটা সম্ভব নয় সে-সব ঘটনার জন্য অপেক্ষা করে বিনা মেঘে বজ্রাঘাত, কবর থেকে মৃতকের পুনরুত্থান, পাখিতে মানুষের রূপান্তর প্রাপ্তি, এমন দিন যেদিন সকালে সূর্য উঠবে না। সচেতন অচেতনভাবে জেনে না জেনে সম্ভব-অসম্ভব কত কিছুর জন্যে মানুষ অপেক্ষা করে, সকিনা খাতুন কান্নাকাটির জন্য অপেক্ষা করবে তা বিচিত্র কী।"

শিল্পী কামরুল হাসান

কয়েক মাস আগে আর্টস কাউন্সিলের উদ্যোগে কামরুল হাসানের একটি একক চিত্রপ্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। এতে মোট ছবি ছিল প'য়ত্রিশটি, প্রায় সবই জলরঙ-এর। পরিণত শিল্পীর সর্বশেষ পর্যায়ের সৃষ্টি স্বভাবতই বিপুল সংখ্যক দর্শকের চিত্তাকর্ষণ করে। লোক ভীড় করে ছবি দেখেছে এবং বিত্তশালী শিল্পানুরাগীরা ভাল ভাল ছবিগুলি তাড়াতাড়ি কিনে নিয়ে গেছেন। ঢাকার অপেক্ষাকৃত নিস্তরঙ্গ সাংস্কৃতিক জীবনে এ এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

এই প্রদর্শনী এতটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল কেন। এক কারণ ছিল ছবিগুলোর আত্যন্তিক উৎকর্ষ। উজ্জ্বল ও সতেজ বর্ণচ্ছটা রেখার অনবদ্য ক্রীড়াময়তার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যে আনন্দময় জীবন-চেতনাকে প্রকাশ করেছে তার আবেদনে সাড়া না দিয়েছে কে ! দর্শকের উৎসাহের একটা দ্বিতীয় কারণও ছিল। কামরুল হাসানের বর্তমান পারদর্শিতার সূত্র ধরে তারা উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেছে শিল্পীর আত্মপ্রকাশের বিবর্তনের ধারাকে। সজাগ চোখের আনন্দই ছিল অন্তরালের এই অতীতকে প্রত্যক্ষ করার মধ্যে। কামরুল হাসান চেনা মানুষ, পূর্বপাকিস্তানের পটভূমিতে তিনি নবীন নন, পুরাতন। তাঁর কলারীতির বিভিন্ন স্তরক্রম বিচারের দ্বারাই তাঁর শিল্পী-সত্তার পূর্ণ পরিচয় সম্যকরূপে নিরূপিত হতে পারে। এই চিন্তা ও চেষ্টার প্রভাব ছাড়াও আরও একটা কারণে এই প্রদর্শনী কৌতূহলী দর্শককে এক বিশেষ পরিতৃপ্তি দান করে। একাধিক প্রতিশ্রুতিশীল তরুণ শিল্পীর গুরু কামরুল হাসান বরাবরই মুক্তহৃদয় ছিলেন। নয়া কলারীতির উদ্ভাবকদের তিনি কখনই অবজ্ঞা করেন নি। অত্যাধুনিকদের অঙ্গ ভঙ্গে তিনি উত্তেজিত হননি, রুষ্ট তরুণের প্রতিবাদের মধ্যে আতংকিত হবার মতো কিছুই খুঁজেই পাননি। পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অক্লান্ত কামরুল হাসান নিজেও রঙরূপ ও মাধ্যমের কোনো সুনির্দিষ্ট একক এলাকায় নিজেকে আবদ্ধ রাখেন নি: অবশ্য নিছক খেয়ালিপনার দাস তিনি কোনোদিনই ছিলেন না। সাম্প্রতিক চিত্রকলার রূপ বিভ্রাটের কেন্দ্রস্থলে বাস করেও তিনি স্থিরচিত্ত ও আত্মবিশ্বাসী বস্তুর অবয়ব সংস্কারের শৃংখলাকে তিনিও ভেঙেছেন, কিন্তু ভেঙে একেবারে তছনছ করে ফেলেন নি, তাকে পুনর্গঠিত করেছেন, নবপরিচর্যা দান করেছেন। প্রদর্শিত ছবিতে এই সুষমার ছাপ ষোলআনা বিদ্যামান ছিল।

দুই

প্রথম পর্যায়ে কামরুল হাসান অত্যন্ত সততার সঙ্গে বাস্তব পরিবেশের চিত্র রচনা করতেন। ত্রুটিহীন সূক্ষ্ম সীমারেখায় ফুটিয়ে তুলতেন প্রকৃতি ও সমাজের বিচিত্র দৃশ্য ও ঘটনাকে। সে রেখা বস্তুসীমা রূপায়ণে, যেমন অভ্রান্ত ছিল তেমনি সরস কারুকার্যেও ছিল সমান দক্ষ। রেখা শিল্পীর ভাবনাকে অনুসরণ করে বাস্তব প্রতিকৃতির মধ্যে উর্ণায় বিদ্রূপ কৌতুক দরদ ভালবাসায় লীলায়িত হয়ে উঠত। আমাদের চিত্রকলার ইতিহাসে কামরুল হাসান স্মরণীয়

হয়ে থাকবেন প্রধানত তাঁর সুস্থ সমাজ-সচেতনার জন্য। শিল্পাচার্য জনয়নুল আবেদীনের প্রিয় শিষ্য কামরুল হাসান গুরুর মতোই সমুন্নত দেহ ও সবল স্বাস্থ্যের অধিকারী, স্বদেশভক্ত এবং মৃত্তিকামুগ্ধ। মাটির কাছাকাছি যারা বাস করে শিল্পী মনেপ্রাণে তাদের কর্মজীবনের ও স্বপ্নকল্পনার রূপকার হতে চেয়েছেন। চিত্র বর্ণমালায় স্বাক্ষরযুক্ত না হলো জীবনরসপুষ্ট চেতনার এই বিশিষ্ট ছাপই তাঁর সৃষ্টিকে অনায়াসে পরিচিত করে দেবে। কামরুল হাসানের অফুরন্ত ও উচ্ছ্বসিত জীবন প্রেমের এক প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এর মনোমুগ্ধকর প্রফুল্লতা, রঙ্গকৌতুক মিশ্রিত এক সন্ধিগ্ধ উদার সুস্মিত মনোভঙ্গী। তাঁর পুরোনো ছবির মধ্যে 'চতুর্থ দফা' স্মরণীয় কীর্তি। প্রশস্তদেহ লোভী ভোগী বৃদ্ধ চতুর্থ পত্নী গ্রহণের জন্য বিবাহ বাসরে উপবিষ্ট আর সন্ত্রস্ত কিশোরী কন্যাকে ঘিরে পাঁচমিশাল আত্মীয়পরিজনবর্গ সকৌতুকে সবটা দৃশ্য নিরীক্ষণ করছে। 'উঁকি'-তে গৃহরুদ্ধ বধূ মাটির ঘরের জানালার ঝাঁপি তুলে অতি সঙ্গোপনে বাইরের নিষিদ্ধ দুনিয়ার বুকে অবাক বিস্ময়ে চোখজোড়া মেলে রেখেছে। শরীরের বাঁকে, কনুয়ের নির্ভরতায়, কোমরের বিছাহারের বঙ্কিম ভঙ্গিতে সে কী করুণ মধুর বিহ্বলতা! এই হচ্ছে আদি কামরুল হাসান, অকৃত্রিম কামরুল হাসান।

কয়েক বছরের মধ্যে কামরুল হাসানের চিত্ররীতির পরিবর্তন সূচিত হয়। রীতিই মুখ্যত, দৃষ্টি গৌণত, নূতন পথ অনুসন্ধান করে। কর্মরত কামার-কুমোর, চর্মকার, স্নানরতা তন্বী, সন্তানবৎসা মাতা অঙ্কিত হলো সূক্ষ্ম সরু রেখার নয়, মোটা তুলির গাঢ় টানে। অকলঙ্কিত বিস্তীর্ণ পটে তরঙ্গায়িত স্থূল রেখায় মূর্ত হয়ে উঠেছে বিভিন্ন কর্মে নিযুক্ত নরনারী, ন্যূনতম আঁচড়ে নির্মিত হয়েছে মহিমান্বিত প্রচারপত্র। তৃতীয় পর্যায়ে এই কলারীতিই জটিলতর কৌশলমণ্ডিত হয়ে তেলরঙ-এর বিচিত্র বর্ণচ্ছটায় প্রাণবন্ত হয়ে উঠল। লালচে ভাঙা প্রাচীরের ওপর উবু হয়ে বসা সোনালি ধূসর বানর রোঁয়া ওঠা ভুরুর নিচ থেকে সংকীর্ণ চোখে পিটপিট করে নিজের গাত্র দর্শন করে, হলদেসবুজ কলাপাতার ঘন অন্তরাল থেকে ত্রিবর্ণের তিন গ্রাম্য বধূ বিস্ফারিত দৃষ্টি মেলে আলোর দিকে তাকায়, নতশির স্নানার্থী নিতম্বিনীর সিক্ত কেশের প্রস্রবণ স্পর্শ করে জনচক্রকে সোপানের ধাপে ধাপে ঢেউয়ের দোলায় ছড়িয়ে পড়ে পরিপূর্ণ নারী দেহের রূপতরঙ্গ। বয়সের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে মাধ্যম ও রীতির প্রয়োগে যেমন নৈপুণ্য বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি শিল্পীর জীবনোপলব্ধিও প্রেমপ্রীতির আস্বাদনে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে।

তিন

কামরুল হাসানের সাম্প্রতিক চিত্রাবলী নূতনতর বৈচিত্র্যের সংবাদবাহী। চেতনার শেকড় বাঙালির দীর্ঘকালীন শিল্পচর্চার ঐতিহ্যের মর্মে প্রবেশ করে সেখান থেকে রস আহরণ করেছে, সে রসে জারিত হয়ে যা সৃষ্টি করতে অনুপ্রাণিত হয়েছে তা যেমন দেশজ তেমনি শিল্পজ। রঙ-এর নির্বাচনে ও ব্যবহারে, রেখার বিশিষ্ট সরলায়ন ও নক্সীকরণে কামরুল হাসান সজ্ঞানে বাংলার লোকজীবনের সমৃদ্ধি বর্ধনকারী কামার-কুমার পটুয়ার কারুকর্ম থেকে অবাধে ঋণ গ্রহণ করেছেন। তাই বলে কামরুল হাসান লোকশিল্পী নন, তিনি আধুনিক চিত্রকর, কুশলী এবং বিদগ্ধ, আত্মসচেতন এবং সমাজসচেতন। প্রতিকৃতি রচনায় তাঁর কোনো উৎসাহ নেই, তিনি প্রকৃতির নকলকার হতে চান না। জীবনের তিনি রূপকার,

বস্তুকে নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে নবরূপ দান করেন, পুনঃসৃষ্টি করেন। আদলটা দেশের প্রাচীন অঙ্কন-পদ্ধতির স্মৃতি বহন করে বটে কিন্তু ঐ পর্যন্তই, বাকিটা ওর নিজস্ব, নূতন, মৌলিক। কল্পনা, বক্তব্য, জীবনদৃষ্টি, কলাদর্শ সবই একালের। পটুয়ার সিংহ মহাশয় কামরুল হাসানের তুলির রেখাঘাতে নবরঙ্গে মেতে ওঠে, সিংনাড়া গরুর রোষ নিশ্বাসের ফুলকিতে ফুল হয়ে ঝরে। মৎসশিকারী বালকের সাফল্যের আনন্দ ছড়িয়ে পড়েছে রক্তপীত হরিৎ বিচিত্র বর্ণের জলজ লতাগুলো ফুলপত্রে। একদিন ছিল যখন কামরুল হাসান পৃথিবী দেখতেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে, অংশত বিশ্লেষণী মনোভাব নিয়ে। চিত্রে তাকে রূপ দিতেন গভীব বেদনা ও দরদে মথিত হৃদয় দিয়ে, কখনও রঙ্গকৌতুক বিদ্রূপের বহ্নি মিশিয়ে। রেখা টানতেন দক্ষ কারিগরের অভ্রান্ত বাস্তব দৃষ্টি সজাগ রেখে, রঙ ঢালতেন পরিমাপ মতো। হালের কামরুল হাসান কল্পনার বিভোর, আঙ্গিক উদ্ভাবনে দুঃসাহসিক, বস্তুশোভার চিত্রণে আদর্শায়ন ও অতিরঞ্জনে বিশ্বাসী, জীবনচেতনায় কবিত্বপূর্ণ। কিন্তু তাই বলে দেশের মাটিতে ভুলে যাননি, লোকঐতিহ্যেব ঐশ্বর্যকে অস্বীকার করেননি। কামরুল হাসান শেষ পর্যন্ত পূর্ববাংলারই সন্তান, তার আশা-আকাঙ্ক্ষার কবি, তার রূপ-সৌন্দর্যের চিত্রকর।